বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ এবং মৃত্যু ১লা নভেম্বর ১৯৫০

''কতবার এই ক্ষান্তবর্ষণ মেঘ থমকানো সন্ধ্যায়, এই মুক্ত প্রান্তরের সীমাহীনতার মধ্যে, কোন দেবতার স্বপ্ন যেন দেখিয়াছি। ...তিনি যে শুধু প্রধান বিচারক, ন্যায় ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী, কিংবা অব্যয় অক্ষয় প্রভৃতি দুরূহ দার্শনিকতার আবরণে আবৃত ব্যাপার তাহা নয় — নাঢ়া বইহারের, কি আজমাবাদের মুক্ত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া মনে হইত তিনিই প্রেম ও রোমান্স, কবিতা ও সৌন্দর্য, শিল্প ও ভাবুকতা - তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, সুকুমার কলাবৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করেন, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়া থাকেন নিঃশেষে প্রিয়জনের প্রীতির জন্য - আবার বিরাট বৈজ্ঞানিকের শক্তি ও দৃষ্টি দিয়া গ্রহ নক্ষত্র নীহারিকা সৃষ্টি করেন।'' —আরণ্যক

আজ থেকে একশো পনেরো বছর আগে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর বিভূতিভূষণের জন্ম হয়। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বনগাঁ মহকুমার অন্তর্গত চালকি বারাকপুর গ্রামে । এক কালে এর কাছেই মোল্লাহাটিতে ছিল নীলকর সাহেবদের কুঠি। বিভূতিভূষণের পিতামহ পানিত্রাস থেকে এখানে এসে সংসার পেতেছিলেন। ছেলে মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি সংস্কৃত শিখবার জন্য কাশী পাঠান, এবং মহানন্দ সেখান থেকে নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে শাস্ত্রী উপাধি নিয়ে দেশে ফেরেন। কিন্তু সংস্কৃত বিদ্যার অর্থকরী শক্তি ততদিনে দেশ থেকে লোপ পেয়েছে। মহানন্দের দারিদ্র্য তাই কোনোদিন ঘোচেনি।

বিভুতিভূষণ মহানন্দের প্রথম সন্তান। তাঁর প্রথম উপন্যাস পথের পাঁচালির সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনের অনেক মিল আছে। হরিহরের মত তাঁর বাবাও পালা লিখতে পারতেন। এবং দেশে দেশে সেই পালায় কথকতা করে, কখনও বা যজমানি করে জীবিকার্জন করতেন। অপুর মতই বিভূতিভূষণের প্রথম শিক্ষা সুরু হয় গ্রাম্য পাঠশালায়। লেখাপড়া শেখার একটা অদম্য ইচ্ছা সেই শৈশবকাল থেকেই তাঁর মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল। অথচ বাড়ির পরিবেশ বিদ্যাশিক্ষার অনুকূল ছিল না। প্রধানত : অভাবের জন্যই ধারাবাহিক ভাবে লেখাপড়া করতে তিনি পারছিলেন না। ইতিমধ্যে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তাঁর উপনয়ন হয়ে গেল। বাড়ির বড় ছেলে এবার যজমানি শুরু করবে এবং সংসারের সুরাহা হবে বোধহয় পিতামাতার এইরকমই ইচ্ছা ছিল।

কিন্তু তাঁর নিজের ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি একদিন তিনি বনগাঁ উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে এলেন। পরিবারের শেষ সম্বল গুটিকতক টাকা মা তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ভর্তি হবার পক্ষে তাও যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়া বছরের মাঝখানে তখন ভর্তির সময়ও নয়। কিন্তু সৌভাগ্যবশত: তিনি প্রধান শিক্ষক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরে পড়ে যান। সেই অসাধারণ শিক্ষকের জহুরির চোখ ছিল। তিনি এই অনভিজ্ঞ, দরিদ্র, গ্রাম্য বালকের আগ্রহ ও চরিত্রবল দেখে নিজে উদ্যোগী হয়ে তাকে ভর্তি করে নেন। পরে তার বাবাকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে ছাত্রাবাসে রাখেন। বাবার মৃত্যুর পর টিউশানি জুটিয়ে দিয়ে এর রোজগারের ব্যবস্থা করে দেন। স্কুলের শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত তিনি বিভূতিভূষণকে পুত্রবৎ রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন, এবং তাঁর তত্বাবধানে বিভূতিভূষণ শুধু স্কুলের পাঠ্যটুকুই নয়, নানাধরনের নানারকম বই পড়ে বাড়িয়ে তোলেন নিজের সাধারণজ্ঞান ও সাহিত্যরুচি।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জলপানি সহ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করে বিভূতিভূষণ কলকাতার কলেজে পড়তে এলেন। ভর্তি হলেন রিপন (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে। এখান থেকেই তিনি ডিস্টিংশনে বি. এ. পাশ করেন ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে। তার আগের বছরই তাঁর বিবাহ হয়ে যায় । পানিতর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, যিনি আগে থাকতেই তাঁদের পরিবারকে চিনতেন, মা মৃণালিনীর কাছে তাঁর মেয়ে গৌরীর জন্য সম্বন্ধ নিয়ে আসেন। তাঁর সাহায্যে বিভূতিভূষণের মা পিতৃগৃহ ছেড়ে এসে আবার বারাকপুরের ভদ্রাসনে নতুন করে সংসার পাতেন। তাঁদের সংসারে একটা স্থিতি ও শান্তি আসে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে সে সুখ দীর্ঘস্থায়ী হল না। বিভূতিভূষণ যখন এম. এ. (এবং আইন) পড়ছেন তখন হঠাৎ এক মহামারীতে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তখন ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ।

এরপর ১৯১৯ থেকে ১৯২৩ বিভূতিভূষণের জীবনে একটা গভীর শূন্যতা নেমে এসেছিল। নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে এতকাল যুদ্ধ করেও তিনি মনের যে আশা ও আনন্দ ধরে রেখেছিলেন তা যেন এক ঝাপটায় নিভে গেল। দিশাহারা হয়ে তিনি পড়া ছেড়ে দিয়ে এক মাইনর স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে গেলেন জঙ্গিপুর।

সে চাকরি অবশ্য তিনি বেশিদিন করেন নি। ইস্তফা দিয়ে পরের বছর কলকাতায় ফিরে তিনি অন্য চাকরির খোঁজ করতে লাগলেন। তখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সুপারিশে তিনি হরিনাভিতে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নাম প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষকের কাজ পান। এখানে থাকতে থাকতেই তাঁর মনে গল্প লেখার বাসনা জাগে। তিনি যে অন্ধকার থেকে আবার জীবনের দিকে ফিরে আসছেন এই বাসনাই তার প্রমাণ। তখনও লেখক হবার কোনো সংকল্প তাঁর ছিল না। খানিকটা খেলাচ্ছলে, ঘাটের পথে নিত্য দেখা একটি স্নেহশীলা বাঙ্গালী বধূর সাদামাটা জীবন নিয়ে গল্পটি লেখা হল। এ গল্প ছাপা হবে তাও তিনি বোধকরি ভাবেন নি। তবু প্রবাসীতেই পাঠালেন এবং যৎসামান্য সংশোধনসহ গল্পটি সেখানে ছাপা হল। প্রবাসী ছিল তখনকার শ্রেষ্ঠ সাময়িকপত্র। প্রবাসীর পাতায় লেখা বেরোনো মানেই বড় মাপের স্বীকৃতি এবং সকলের চোখে পড়া উৎসাহিত হয়ে বিভূতিভূষণ আরও দু একটি ছোটগল্প প্রকাশ করলেন। আশ্চর্য এই যে গল্প লেখার কারণেই তাঁকে এবার হরিনাভি ছাড়তে হল। তাঁর গল্পে চেনা নারীর ছায়া দেখতে পেয়ে পল্লীগ্রামের কুৎসাপ্রবণ লোকেরা তাঁকে বদনাম দিয়ে তাড়িয়ে ছাড়ল।

ততদিনে তাঁর ভাগ্য অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বিভূতিভূষণ পাথুরিয়াঘাটার খেলাতবাবুদের বাড়িতে গৃহশিক্ষকের চাকরি নিয়ে ঢুকেছিলেন। এঁরা ছিলেন বড় জমিদার। ভাগলপুরের দূর গ্রামাঞ্চলে একটা জনমানববর্জিত বিশাল জঙ্গলমহল ছিল তাঁদের । এখানে প্রজাবিলি হবে। তার জন্য চার পাঁচ বছর লাগবে। সেখানে নায়ের গোমস্তা যা যা থাকবার তা তো ছিলই। কিন্তু মালিকরা চাইছিলেন তাদের মাথার ওপর এমন একজন থাকুক যে হবে সৎ নিষ্ঠাবান ও শিক্ষিত। বিভূতিভূষণকে তাঁরা এই কাজের প্রস্তাব দেন।

এ তাঁর মনের মতো কাজ। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি সেখানে রওনা হলেন। পরবর্তী ছ সাত বছর তিনি ওখানেই ছিলেন। নির্জনে, প্রকৃতির সান্নিধ্যে, প্রিয় পরিবেশে সহজ সরল দরিদ্র গ্রাম্য মানুষজনের সংস্পর্শে আস্তে আস্তে তাঁর মনের গ্লানি দূর হল। স্মৃতির ভিতর থেকে স্বচ্ছভাবে ফুটে উঠল তাঁর এতকালের যাপিত জীবন - ইছামতী তীর, বারাকপুর গ্রাম, সে গ্রামের বন্য শোভা, বাবা মা, মৃত বোন, তাঁর স্বপ্নভরা শৈশব, সবকিছু। একটু একটু করে সময় নিয়ে তিনি পথের পাঁচালি লিখলেন। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল বিচিত্রা পত্রিকায়। পরে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রঞ্জন প্রকাশালয় থেকে সজনীকান্ত দাস এ বই প্রকাশ করলেন। বাংলা সাহিত্যে দেখা দিল এক নতুন নক্ষত্র।

এরপর থেকে আমৃত্যু বিভূতিভূষণ অবিচ্ছেদে সাহিত্যসাধনা করেছেন। দু এক জায়গায় শিক্ষকতা করেছিলেন বটে তবে সে কাজে আর তাঁর তেমন মন ছিল না। লেখাই ছিল প্রধান কাজ। ছোটগল্প ও উপন্যাস দু রকম রচনাতেই তিনি পারদর্শী ছিলেন। এর সঙ্গে আর যা তিনি শিখেছিলেন তা হল ডায়েরি। প্রথম গল্প উপেক্ষিতা থেকে শেষ উপন্যাস ইছামতী পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যিক জীবনের পরিধি পঁচিশ বছরের মত। সে তুলনায় তাঁর রচনার সংখ্যা অনেক। ভারতের এবং পৃথিবীর নানা ভাষায় তাঁর বই অনূদিত হয়েছে। এদের মধ্যে পথের পাঁচালিই সবচেয়ে বিখ্যাত। তবে তাঁর অপরাজিত, আরণ্যক, ও ইছামতী গুণমানে পথের পাঁচালির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

সৃষ্টিসন্ধান

১৯৩০ থেকে কলকাতার সাহিত্যিকসমাজের সঙ্গে বিভূতিভূষণ পরিচিত হলেন। সজনীকান্ত দাস, গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রভৃতিরা ছিলেন তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু। তাঁর এখন থেকে একটা সামাজিক জীবন হল। কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি কোনদিনই শহুরে চালাক চতুর উচ্চাকাঙ্খী হন নি। নিজের গুণাগুণ সম্বন্ধে তাঁর খুব একটা সচেতনতাও ছিল না। চিরকালের অর্থকষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে এবং ছোট ভাইকে ডাক্তারি পাশ করিয়ে এখন তিনি জীবনে দায়মুক্ত স্বাধীন পুরুষ। এই স্বাধীনতাকে তিনি উপভোগ করতেন নানা স্থানে বেড়িয়ে (প্রধানত অজানা জঙ্গলে), এবং বই পড়ে। পড়ে বারাকপুরের ভদ্রাসনটি সংস্কার করেছিলেন এবং ঘাটশীলায় গাছপালা ঘেরা একটি ছোট বাড়িও করেছিলেন। দুই বাড়িই মাটির। এই তাঁর বিষয়সম্পত্তির সীমা। যৌবনে স্ত্রীবিয়োগের পর আবার সংসার করবার ইচ্ছা তাঁর মনে জাগে নি। অবশেষে তাঁর বয়স যখন পঁয়তাল্লিশ পার হয়েছে তখন রমা দেবীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। শোনা যায় এই বয়সে বিয়ে করতে তাঁর মনে দ্বিধা ছিল, কিন্তু পাত্রীপক্ষের আগ্রহেই শেষ পর্যন্ত ১৯৪০ এর ডিসেম্বর মাসে তাঁদের বিয়ে হল। ১৯৪৭এ জন্ম হল পুত্র তারাদাসের। যে সংসার সুখ এতদিন তাঁর অধরা ছিল জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে তিনি তা পেয়েছিলেন। পাবার পর কিন্তু বাঁচেন নি বেশিদিন। ১৯৫০ এর ১লা নভেম্বর ঘাটশীলায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁর শেষ উপন্যাসে সদ্যপ্রকাশিত ইছামতী রবীন্দ্র পুরস্কার পেল।

''গভীর রাত পর্যন্ত বড় বাসার (ভাগলপুরের জমিদারি কাছারি) ছাদে বসে, মেঘলা রাতে কত কথা মনে আসে — আবার যদি জন্মই হয়, তবে যেন ঐ রকম দীনহীনের পর্ণকুটীরে, অভাব অনটনের মধ্যে, পল্লীর স্বচ্ছতোয়া গ্রাম্য নদী, গাছপালা, নিবিড় মাটির গন্ধ, অপূর্ব সন্ধ্যা, মোহভরা দুপুরের মধ্যেই হয়।''

বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ

১। পথের কবি - কিশলয় ঠাকুর
২। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর - সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪। বিভূতিভূষণ - দ্বন্দ্বের বিন্যাস - রুশতী সেন
৫। পথের পাঁচালি, অপরাজিত, ইছামতী- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[এই তিনখানি উপন্যাস লেখকের আত্মজীবনভিত্তিক। বইয়ের ঘটনাগুলি কল্পিত। কিন্তু লেখকের অন্তর্জীবনের সমস্ত ইতিহাসটি এখানে পাওয়া যায়। যথাক্রমে তাঁর শৈশব, যৌবন ও প্রৌঢ়বয়সের ধ্যানধারনা এখানে লভ্য।]

পুস্তক তালিকা - প্রকাশকাল ভিত্তিক

১৯২৯ : পথের পাঁচালি (উপন্যাস)
১৯৩১ : মেঘমল্লার (ছোটগল্প)
১৯৩২ : অপরাজিত (উপন্যাস)
১৯৩২ : মৌরিফুল (ছোটগল্প)
১৯৩৪ : যাত্রাবদল (ছোটগল্প)
১৯৩৫ : দৃষ্টিপ্রদীপ (উপন্যাস)
১৯৩৭ : বিচিত্র জগৎ (ছোট ছোট রচনা)
১৯৩৮ : চাঁদের পাহাড় (ছোটদের উপন্যাস)
জন্ম ও মৃত্যু (গল্প) আইভ্যানহো (অনুবাদ)
কিন্নরদল (ছোটগল্প)
১৯৩৯ : আরণ্যক (উপন্যাস)
১৯৪০ : মরনের ডঙ্কা বাজে (ছোটদের উপন্যাস)
আদর্শ হিন্দু হোটেল (উপন্যাস)
১৯৪১ : অভিযাত্রিক (ভ্রমণ ডায়েরি)
বেনীগির ফুলবাড়ি (ছোটগল্প)
স্মৃতির রেখা (ডায়েরি)
বিপিনের সংসার (উপন্যাস)
দুই বাড়ি (উপন্যাস)
১৯৪২ : মিসমিদের কবচ (ছোটদের উপন্যাস)
অনুবর্তন (উপন্যাস)
১৯৪৩ : তৃণাঙ্কুর (ডায়েরি)
টমাস বাটার আত্মজীবনী (অনুবাদ)
১৯৪৪ : নবাগত (ছোটগল্প)
তালনবমী (ছোটগল্প)
উর্মিমুখর (ডায়েরি)
দেবযান (উপন্যাস)
আম আঁটির ভেঁপু (পথের পাঁচালির কিশোর সংস্করন)
১৯৪৫ : উপলখণ্ড (ছোটগল্প)
বিধু মাস্টার (ছোটগল্প)
কেদার রাজা (ছোটগল্প)
বনে পাহাড়ে (ভ্রমণ ডায়েরি)
ক্ষণভঙ্গুর (ছোটগল্প)
১৯৪৬ : উৎকর্ণ (ডায়েরি)
অসাধারণ (ছোটগল্প)
হীরা মানিক জ্বলে (ছোটদের উপন্যাস)
১৯৪৭ : অথৈজল (উপন্যাস)
মুখোশ ও মুখশ্রী (ছোটগল্প)
১৯৪৮ : হে অরণ্য কথা কও (দিনলিপি)
আচার্য কৃপালনি কলোনি (ছোটগল্প)
১৯৪৯ : জ্যোতিরিঙ্গন (ছোটগল্প)
১৯৫০ : ইছামতী (উপন্যাস)
কুশল পাহাড়ি (ছোটগল্প)
১৯৫৯ : অশনি সংকেত (সাময়িক পত্রে)
ষোল বছর আগে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল)

১। বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পরে তাঁর অপ্রকাশিত অপ্রধান কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছে।
২। নানাবিধ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, যথা -
শ্রেষ্ঠ গল্প
শ্রেষ্ঠ কিশোর সঞ্চয়
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
গল্প পঞ্চাশৎ
৩। মিত্র ও ঘোষ প্রকাশন থেকে টীকা ও ভূমিকা সমেত দ্বাদশ খণ্ডে, এবং টীকা ও ভূমিকাহীন সুলভ সংস্করণ দশ খণ্ডে বিভূতি রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

সৃষ্টিসন্ধান